# سورة المدثر

# সূরা মুদ্দাস্‌সির

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৬ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ﴿۱﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ﴿۲﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ﴿۳﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ﴿۴﴾
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۙ﴿۵﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۙ﴿۶﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ؕ﴿۷﴾ فَاِذَا نُقِرَ
فِي النَّاقُوْرِ ۙ﴿۸﴾ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۙ﴿۹﴾ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ
يَسِيْرٍ ﴿۱۰﴾ ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۙ﴿۱۱﴾ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۙ﴿۱۲﴾
وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۙ﴿۱۳﴾ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۙ﴿۱۴﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۙ﴿۱۵﴾
كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ؕ﴿۱۶﴾ سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ؕ﴿۱۷﴾ اِنَّهٗ
فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۙ﴿۱۸﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۙ﴿۱۹﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۙ﴿۲۰﴾ ثُمَّ نَظَرَ ۙ﴿۲۱﴾
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۙ﴿۲۲﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۙ﴿۲۳﴾ فَقَالَ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ
يُّؤْثَرُ ۙ﴿۲۴﴾ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ؕ﴿۲۵﴾ سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ﴿۲۶﴾ وَمَاۤ
اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ؕ﴿۲۷﴾ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ۚ﴿۲۸﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۚۖ﴿۲۹﴾ عَلَيْهَا
تِسْعَةَ عَشَرَ ؕ﴿۳۰﴾ وَمَا جَعَلْنَاۤ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا
عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَاۤ

أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى
لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ اِنَّهَا
لَاِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ
اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾ فِىْ جَنّٰتٍ
يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوْا
لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوْضُ
مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾ حَتّٰىٓ اَتٰىنَا
الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ
التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ
يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ؕ بَلْ لَّا
يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٥﴾ وَمَا
يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

**পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু**

(১) হে চাদরাবৃত, (২) উঠুন, সতর্ক করুন, (৩) আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন (৪) আপন পোশাক পবিত্র করুন (৫) এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৬) অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দেবেন না। (৭) এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে সবর করুন। (৮) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে; (৯) সেদিন হবে কঠিন দিন, (১০) কাফিরদের জন্য এটা সহজ নয়। (১১) যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। (১২) আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়েছি (১৩) এবং সদাসংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি, (১৪) এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। (১৫) এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দিই (১৬) কখনই নয়। সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (১৭) আমি সত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ

করাব। (১৮) সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে, (১৯) ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে, (২০) আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে। (২১) সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে, (২২) অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে, (২৩) অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে, (২৪) এরপর বলেছে ঃ এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ নয়, (২৫) এ তো মানুষের উক্তি বৈ নয়। (২৬) আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে। (২৭) আপনি কি বুঝলেন অগ্নি কি ? (২৮) এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না (২৯) মানুষকে দগ্ধ করবে। (৩০) এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশজন ফেরেশতা। (৩১) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফিরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তাদের এই সংখ্যা করেছি---যাতে কিতাবীরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মু'মিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফিররা বলে যে, আল্লাহ্ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (৩২) কখনই নয়। চন্দ্রের শপথ, (৩৩) শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়, (৩৪) শপথ প্রভাতকালের, যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়, (৩৫) নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম, (৩৬) মানুষের জন্য সতর্ককারী (৩৭) তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে। (৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী ; (৩৯) কিন্তু ডানদিকস্থরা, (৪০) তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে (৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে (৪২) বলবে ঃ তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে ? (৪৩) তারা বলবে ঃ আমরা নামায পড়তাম না, (৪৪) অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, (৪৫) আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম (৪৬) এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম (৪৭) আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। (৪৮) অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (৪৯) তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ? (৫০) যেন তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গর্দভ (৫১) হট্টগোলের কারণে পলায়নপর। (৫২) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক। (৫৩) কখনও না বরং তারা পরকালকে ভয় করে না। (৫৪) কখনও না, এটা তো উপদেশ মাত্র। (৫৫) অতএব যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক। (৫৬) তারা স্মরণ করবে না কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

---

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, উঠুন ( অর্থাৎ স্বীয় জায়গা থেকে উঠুন অথবা প্রস্তুত হোন) অতঃপর ( কাফিরদেরকে ) সতর্ক করুন, ( যা নবুয়তের দায়িত্ব । এখানে 'সুসংবাদ প্রদান করুন' বলা হয়নি। কারণ, আয়াতটি একেবারেই নবুয়তের প্রথম দিকের। তখন দু-একজন ছাড়া কেউ মুসলমান ছিল না। ফলে সতর্ক করাই অধিক সমীচীন ছিল )। আপন পালনকর্তার

মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, (কেননা, তওহীদই তবলীগের প্রধান বিষয়বস্তু। অতঃপর নিজেরও কতিপয় জরুরী পালনীয় কর্ম, বিশ্বাস ও চরিত্রের শিক্ষা রয়েছে। কারণ, যে তবলীগ করবে, তারও আত্মসংশোধন প্রয়োজন)। আপন পোশাক পবিত্র রাখুন (এটা কর্ম সম্পর্কিত বিষয়। শুরুতে নামায ফরয ছিল না, তাই নামাযের আদেশ করা হয়নি। দ্বিতীয় এই যে) এবং প্রতিমা থেকে দূরে থাকুন [যেমন এ পর্যন্ত আছেন। এটা বিশ্বাসগত বিষয়। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের ন্যায় তওহীদে অটল থাকুন। রসূলুল্লাহ্ (সা) শিরকে লিপ্ত হবেন এরূপ আশংকা ছিল না। তবুও তওহীদের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁকে এই আদেশ করা হয়েছে]। প্রতিদানে অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অন্যকে কিছু দেবেন না। [এটা চারিত্রিক বিষয়। পয়গম্বর ব্যতীত অপরের জন্য এ কাজ জায়েয হলেও অনুত্তম। সূরা রোমের আয়াত وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا এর তফসীর থেকে একথা জানা যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শান ও মর্যাদা সবার উর্ধ্বে, তাই এটা তাঁর জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে]। এবং (সতর্ককরণের কাজে নির্যাতনের সম্মুখীন হলে তজ্জন্য) আপনার পালনকর্তার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে সবর করুন। (এটা তবলীগ সম্পর্কিত বিশেষ নৈতিকতা। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতসমূহে নিজের ও অপরের চরিত্র এবং কর্ম সংশোধনের বিভিন্ন ধারা ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর সতর্ক করার পরও যারা ঈমান আনে না, তাদের জন্য এই শাস্তিবাণী রয়েছে যে) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন কাফিরদের জন্য এক ভয়াবহ দিন হবে, যা কাফিরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না। (অতঃপর কতিপয় বিশেষ কাফির সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) যাকে আমি (সন্তান ও ধন সম্পদ থেকে রিক্ত) একক সৃষ্টি করেছি (জন্মের সময় কারও ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থাকে না। এখানে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে বোঝানো হয়েছে)। তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন (আমিই তাকে বুঝে নেব)। আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়েছি ও সদাসংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। এরপরও (সে ঈমান এনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি বরং কুফর ও অমর্যাদার ভঙ্গিতে এই বিপুল ধনসম্পদকে সামান্য মনে করে) সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দিই। কখনও (সে বেশী দেওয়ার যোগ্য) নয়, (কেননা,) সে আমার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (বিরুদ্ধাচরণের সাথে যোগ্যতা কিরূপে থাকতে পারে। তবে ঢিলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেশী দিলে সেটা ভিন্ন কথা। আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে এই ব্যক্তির উন্নতি বাহ্যত বন্ধ হয়ে যায়। সে মতে এরপর তার কোন সন্তান হয়নি এবং ধনসম্পদও বাড়েনি। এ শাস্তি দুনিয়াতে আর পরকালে) তাকে সত্বরই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই) জাহান্নামের পাহাড়ে আরোহণ করাব। (তিরমিযীর হাদীসে আছে জাহান্নামে একটি পাহাড়ের নাম 'সউদ'। সত্তর বছরে এর শৃঙ্গে পৌঁছুবে, এরপর সেখান থেকে নিচে পড়ে যাবে। এরপর সর্বদাই এমনিভাবে আরোহণ করবে এবং নিচে পতিত হবে। উল্লিখিত হঠকারিতাই এই শাস্তির কারণ। অতঃপর এর আরও কিছু বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ) সে চিন্তা করেছে (যে কোর-আন সম্পর্কে কি বলা যায়) অতঃপর (চিন্তা করে) মনস্থির করেছে (পরে তা বর্ণিত হবে)। ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে (এ বিষয়ে) মনস্থির করেছে। আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে (এ বিষয়ে) মনস্থির করেছে। (তীব্র নিন্দা জ্ঞাপনার্থে বারবার বিস্ময় প্রকাশ করা

হয়েছে)। অতঃপর সে (উপস্থিত লোকজনের প্রতি) দৃষ্টিপাত করেছে (যাতে স্থিরীকৃত কথাটি তাদের কাছে বলে) অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছে এবং মুখ বিকৃত করেছে, অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে। (আপত্তিকর বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার সময় মুখ বিকৃত করে ঘৃণা প্রকাশ করাই সাধারণ অভ্যাস)। এরপর বলেছেঃ এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ নয়, এ তো মানুষের উক্তি বৈ নয়। (উপরোক্ত মনস্থির করার বিষয়বস্তু এটাই। উদ্দেশ্য এই যে, এই কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম নয় বরং মানুষের কালাম, যা তিনি কোন যাদুকরের কাছ থেকে বর্ণনা করেন অথবা তিনি নিজেই এর রচয়িতা। তবে বিষয়বস্তু তাদের কাছ থেকে বর্ণিত, যারা পূর্বে নবুয়ত দাবী করত।

অতঃপর এই হঠকারিতার বিস্তারিত শাস্তি উল্লেখ করা হচ্ছে। পূর্বে سَأُرْهِقُهُ বাক্যে তা সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছিল)। আমি সত্বরই তাকে জাহান্নামে দাখিল করব। আপনি কি বুঝলেন জাহান্নাম কি? এটা (এমন যে, প্রবিষ্ট ব্যক্তির কোন কিছু দগ্ধ করতে) বাকী রাখবে না এবং (কোন কাফিরকে ভিতরে না নিয়ে) ছাড়বে না। মানুষকে দগ্ধ করবে। এর উপর নিয়োজিত থাকবে উনিশ জন ফেরেশতা। তাদের একজনের নাম মালেক। তারা কাফিরদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেবে। শক্তিশালী একজন ফেরেশতাই জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও উনিশ জনকে নিয়োগ করা থেকে বোঝা যায় যে, শাস্তি দানের কাজটি খুবই গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন করা হবে। উনিশ সংখ্যার গূঢ় তত্ত্ব আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে অভাজনের কাছে যা অধিক গ্রহণযোগ্য, তা এই যে, আসলে সত্য বিশ্বাস-সমূহের বিরোধিতার কারণে কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কর্ম সম্পর্কিত নয় এমন অকাট্য বিশ্বাস নয়টি ১. আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. জগতের নতুনত্বে বিশ্বাস করা, ৩. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ৪. সমস্ত ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাস রাখা, ৫. পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা, ৬. তকদীরে বিশ্বাস করা, ৭. কিয়ামতে বিশ্বাস করা। ৮. জান্নাত ও ৯. দোযখে বিশ্বাস করা। অন্যসব বিশ্বাস এগুলোর শাখা-প্রশাখা। কর্ম সম্পর্কিত অকাট্য বিশ্বাস দশটি---পাঁচটি করণীয় অর্থাৎ এগুলো করা যে ওয়াজিব, তা বিশ্বাস করা জরুরী। যথা, ১. কালেমা উচ্চারণ করা, ২. নামায কায়েম করা, ৩. যাকাত দেওয়া, ৪. রমযানের রোযা রাখা এবং ৫. বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা। আর পাঁচটি বর্জনীয় অর্থাৎ এগুলো করা হারাম এরূপ বিশ্বাস রাখা জরুরী। যথা, ১. চুরি করা, ২. ব্যভিচার করা, ৩. হত্যা করা, বিশেষত সন্তান হত্যা করা, ৪. অপবাদ আরোপ করা, ৫. সৎ কাজে অবাধ্যতা করা, এতে গীবত, জুলুম, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করা ইত্যাদি দাখিল আছে। এখন সব বিশ্বাসের সমষ্টি হল উনিশ। সম্ভবত এক এক বিশ্বাসের শাস্তি দেওয়ার জন্য এক একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। তওহীদের বিশ্বাসটি সর্ববৃহৎ বিধায় তার জন্য একজন বড় ফেরেশতা মালেককে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই আয়াতের বিষয়বস্তু শুনে কাফিররা উপহাস করেছিল। (তাই পরবর্তী বিষয়বস্তু নাযিল হয় অর্থাৎ) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক (মানুষ নয়) কেবল ফেরেশতা নিযুক্ত করেছি। (তাদের মধ্যে এক একজন ফেরেশতা সমস্ত জিন ও মানবের সমান শক্তিধর)

আমি তাদের সংখ্যা ( বর্ণনায় ) এরূপ ( অর্থাৎ উনিশ ) রেখেছি কেবল কাফিরদের পরীক্ষার জন্য যাতে কিতাবীরা ( শোনার সাথে সাথে ) দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, মু'মিনদের ঈমান বেড়ে যায় এবং কিতাবিগণ ও মু'মিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে ( সন্দেহের ) রোগ আছে তারা এবং কাফিররা বলে যে, আল্লাহ্ এই আশ্চর্য বিষয়বস্তু দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন ? ( কিতাবীদের বিশ্বাসী হওয়ার কথা বলার দুটি কারণ সম্ভবপর---১. তাদের কিতাবেও এই সংখ্যা লিখিত আছে। অতএব শোনা মাত্রই মেনে নেবে। তাদের কিতাবে এখন এই সংখ্যা উল্লিখিত না থাকলে সম্ভবত বিকৃতির কারণে মিটে যায়। ২. তাদের কিতাবে যদি এই সংখ্যা না থাকে, তবে তারা ফেরেশতাগণের অসাধারণ শক্তিমত্তায় বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণনা ব্যতীত জানার উপায় নেই ; এমন অনেক বিষয় তাদের কিতাবে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং সেগুলোর ন্যায় এই সংখ্যার বিষয়কে অস্বীকার করার কোন ভিত্তি তাদের কাছে ছিল না। অতএব আয়াতে বিশ্বাসের অর্থ হবে অস্বীকার ও উপহাস না করা। এই দু'টি কারণের মধ্য থেকে প্রথম কারণটি স্পষ্ট। মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ারও দুটি কারণ হতে পারে---১. কিতাবীদের বিশ্বাস দেখে তাদের ঈমান গুণগত শক্তিশালী হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সা) কিতাবীদের সাথে মেলামেশা না করা সত্ত্বেও তাদের ওহীর অনুরূপ খবর দেন। অতএব তিনি অবশ্যই সত্য নবী। ২. নতুন কোন বিষয়বস্তু অবতীর্ণ হলেই মু'মিনগণ তৎপ্রতি ঈমান আনত। সুতরাং সংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নাযিল হওয়ার ফলে তাদের ঈমানের পরিমাণ বেড়ে গেল। এরূপ সন্দেহ পোষণ না করার কথাটি তাকীদার্থে সংযুক্ত করা হয়েছে। রোগ কি, এ ব্যাপারেও দুরকম সম্ভাবনা আছে---১. সন্দেহ ; কেননা, সত্য প্রকাশিত হলে কেউ কেউ তা অস্বীকার করে এবং কেউ তা মেনে নিতে ইতস্তত করে। মক্কাবাসীদের মধ্যেও এমন লোক থাকা বিচিত্র নয়। ২. নিফাক তথা কপটতা। এমতাবস্থায় আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, মদীনায় কপট বিশ্বাসী থাকবে এবং তাদের এই বক্তব্য হবে। মু'মিন ও কিতাবীদের বিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ না করার বিষয়টি আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, কিতাবীদের বিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ না করা হল আভিধানিক অর্থে এবং মু'মিনদের শরীয়তের পরিভাষাগত অর্থে। অতঃপর উভয় দলের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে মু'মিনগণকে যেমন বিশেষ হিদায়ত দান করেছেন এবং কাফিরদেরকে বিশেষ পথভ্রষ্ট করেছেন, এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দান করেন। ( অতঃপর পূর্বের বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের সংখ্যা উনিশ বিশেষ রহস্যের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। নতুবা ) আপনার পালনকর্তার ( এসব ) বাহিনী ( অর্থাৎ ফেরেশতাদের সংখ্যা এত প্রচুর যে, তাদের ) সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। ( তিনি ইচ্ছা করলে অগণিত ফেরেশতাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে পারতেন। এখনও তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা উনিশ হলেও তাদের সহকারী ও সাহায্যকারী অনেক। মুসলিমের হাদীসে আছে, জাহান্নামকে এমতাবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তার সত্তর হাজার বল্গা থাকবে এবং প্রত্যেক বল্গা সত্তর হাজার ফেরেশতা ধারণ করে রাখবে। জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করার যা আসল উদ্দেশ্য, তা সংখ্যাল্পতা অথবা সংখ্যাধিক্য অথবা উনিশ সংখ্যার রহস্য উন্মোচন করা অথবা না করার উপর নির্ভরশীল নয় এবং সেই আসল

উদ্দেশ্য এই যে ) এটা ( অর্থাৎ জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করা ) মানুষের জন্য উপদেশ বৈ নয় ( যাতে তারা আযাবের কথা শুনে সতর্ক হয় এবং ঈমান আনে। এই উদ্দেশ্য কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং আসল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যে রেখে এসব বাড়তি বিষয়ের পেছনে না পড়াই যুক্তিসঙ্গত। অতঃপর জাহান্নামের শাস্তির কিছুটা বর্ণনা আছে, যা মানুষের জন্য উপদেশ হওয়ার দিকটিকে ফুটিয়ে তোলে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ ) চন্দ্রের শপথ, শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়, শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়, নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম। মানুষের জন্য সতর্ককারী— তোমাদের মধ্যে যে, ( সৎ কাজের দিকে ) অগ্রণী হয়, তার জন্য অথবা যে ( সৎ কাজ থেকে ) পশ্চাতে থাকে, তার জন্যও। ( অর্থাৎ সবার জন্য সতর্ককারী। এই সতর্ককরণের ফলাফল কিয়ামতে প্রকাশ পাবে, তাই কিয়ামতের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিষয়সমূহের শপথ করা হয়েছে। সেমতে চন্দ্রের বৃদ্ধি ও হ্রাস এ জগতের উন্নয়ন ও অবক্ষয়ের নমুনা। চন্দ্র যেমন এক সময়ে তার আলো হারিয়ে ফেলে, তেমনি জগৎও নিরেট অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। এমনি-ভাবে দিবা ও রাত্রির পারস্পরিক সম্পর্কের অনুরূপ সত্যাসত্যের গোপনীয়তা ও বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে বিশ্বজগৎ ও পরকালের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং বিশ্বজগতের বিলুপ্তি রাত্রির অবসানের মত এবং পরকালের প্রকাশ প্রভাতকালীন ঔজ্জ্বল্য সদৃশ। অতঃপর দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ ) প্রত্যেক ব্যক্তি তার ( কুফরী ) কৃত-কর্মের বিনিময়ে ( জাহান্নামে ) আটক থাকবে কিন্তু ডানদিকস্থরা ( অর্থাৎ মু'মিনগণ, তাঁদের বিবরণ সূরা ওয়াকিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। নৈকট্যশীলগণও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা জাহা-ন্নামে আটক থাকবে না ) তাঁরা থাকবে জান্নাতে ( এবং ) অপরাধী কাফিরদের অবস্থা ( তাদের কাছেই ) জিজ্ঞাসা করবে। ( জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক বাক্যালাপ কিরূপে হবে, এসম্পর্কে সূরা আ'রাফের তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। শাসানোর জন্য এই জিজ্ঞাসা করা হবে। মু'মিনগণ কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করবে ) তোমাদেরকে জাহান্নামে কিসে দাখিল করল? তারা বলবে ঃ আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে ( ওয়াজিব ) আহার্য দিতাম না এবং যারা ( সত্য ধর্মের বিপক্ষে ) সমালোচনামুখর ছিল, আমরাও তাদের সাথে মিলে ( ধর্মের বিপক্ষে ) আলোচনা করতাম এবং প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। ( অর্থাৎ নাফরমানীর উপরই আমাদের জীবনাবসান হয়। ফলে আমরা জাহান্নামে চলে এসেছি। এ থেকে জরুরী হয় না যে, কাফিররাও নামায, রোযা ইত্যাদি ব্যাপারে আদিষ্ট। কেননা, জাহান্নামে দুটি বিষয় থাকবে—এক. আযাব ও দুই. আযাবের তীব্রতা। সুতরাং উল্লিখিত কর্মসমূহের সমষ্টি আযাব ও আযাবের তীব্রতা এই দুই-এর কারণ হতে পারে, এভাবে যে, কুফর ও শিরক কারণ হবে আযাবের এবং নামায ইত্যাদির তরক কারণ হবে আযাবের তীব্রতার। কাফিররা নামায-রোযা ইত্যাদির ব্যাপারে আদিষ্ট নয়---এর অর্থ এই নেওয়া হবে যে, নামায-রোযার কারণে তাদের আসল আযাব হবে না এবং মূল ঈমানের সাথে যেহেতু নামায-রোযাও প্রসঙ্গ ক্রমে এসে যায়, তাই নামায-রোযা তরক করার কারণে আযাবের তীব্রতা হতে পারে )। অতএব ( উল্লিখিত অবস্থায় ) সুপারিশ-কারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। ( অর্থাৎ কেউ তাদের জন্য সুপারিশই

করতে পারবে না। কারণ, অন্য এক আয়াতে আছে ঃ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ —কুফ-

রের কারণে যখন তাদের এই দুর্গতি হবে, তখন ) তাদের কি হল যে, তারা ( কোরআনের এই ) উপদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয় যেন তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গর্দভ, সিংহ থেকে পলায়নপর। ( এই তুলনায় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথমত গর্দভ বোকামি ও নির্বুদ্ধিতায় সুবিদিত। দ্বিতীয়ত তাকে বন্য ধরা হয়েছে, যে ভয় করার নয়, এমন জিনিসকেও অহেতুক ভয় করে এবং পালিয়ে ফিরে। তৃতীয়ত সিংহকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। ফলে তার পলায়ন যে চরম পর্যায়ের হবে, তা বলাই বাহুল্য। এই পলায়নের অন্যতম কারণ এই যে, কাফিররা কোরআনকে তাদের ধারণায় যথেষ্ট দলীল মনে করে না ) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় যে, তাকে উন্মুক্ত ( ঐশী ) কিতাব দেওয়া হোক।---[ দুররে-মনসূরে কাতাদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কতক কাফির রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল ঃ আপনি যদি আমাদের অনুসরণ কামনা করেন, তবে বিশেষভাবে আমাদের নামে আকাশ থেকে এমন কিতাব আসতে হবে, যাতে আপনাকে অনুসরণ করার আদেশ থাকবে। অন্য এক আয়াতে যেমন আছে ঃ

حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তোলার জন্য مُنَشَّرَةً ( উন্মুক্ত )

শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ; অর্থাৎ সাধারণ পত্র যেমন খোলা হয় ও পঠিত হয়, তেমনি পত্র আমাদের নামে আসা চাই। অতঃপর এই বাজে দাবী খণ্ডন করা হয়েছে ঃ ] কখনই না, ( এর প্রয়োজন নেই এবং এর যোগ্যতাও তাঁদের মধ্যে নেই। বিশেষত অনুসরণের নিয়তে এই দাবী করা হয়নি )। বরং ( কারণ এই যে, ) তারা পরকালকে ( অর্থাৎ পরকালের আযাবকে ) ভয় করে না। তাই ( সত্যান্বেষণ নেই। কেবল হঠকারিতাবশতই এসব দাবী করা হয়, যদি কদাচ

এসব দাবী পূরণও করা হয় তবে তার অনুসরণ করবে না। অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ অতঃপর খণ্ডন ও শাসানোর ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে,

যখন প্রমাণিত হল যে, তোমাদের দাবী অনর্থক, তখন এটা ) কখনও ( হতে পারে ) না ; (বরং) এটাই ( অর্থাৎ কোরআনই ) যথেষ্ট উপদেশ, অন্য সহীফার প্রয়োজন নেই। অতএব যার ইচ্ছা, সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক এবং যার ইচ্ছা, সে জাহান্নামে যাক। আমার তাতে পরওয়া নেই। কোরআন দ্বারা কিছু কিছু মানুষের হিদায়ত হয় না ঠিক, কিন্তু এতে কোরআনের কোন ত্রুটি নেই। কোরআন স্বস্থানে হিদায়ত, কিন্তু ) আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না। ( আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হওয়ার পিছনে অনেক রহস্য আছে। কিন্তু কোরআন অবশ্যই উপদেশ। অতএব এ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর। কেননা ) তিনিই ( অর্থাৎ তাঁর আযাবই ভয়ের যোগ্য ) এবং তিনিই

( বান্দার গোনাহ্ ) ক্ষমা করার অধিকারী। ( অন্য আয়াতে আছে ঃ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

সূরা মুদ্দাস্‌সির সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরাও বলেছেন। সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা ইক্‌রার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কোরআন অবতরণ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় পথ চলাকালে উপর দিক থেকে কিছু আওয়ায শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে, সেই হেরা গিরিগুহায় আগমনকারী ফেরেশতা শূন্য মণ্ডলে একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে হেরা গিরিগুহার অনুরূপ তিনি আবার ভীত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং বললেন ঃ زملونى زملونى আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে গেলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। তাই আয়াতে তাঁকে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 'হে বস্ত্রাবৃত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি دثار থেকে উদ্ভূত। অর্থ শীত ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাধারণ পোশাকের উপর ব্যবহৃত অতিরিক্ত বস্ত্র। مزمل শব্দের অর্থ এর কাছাকাছি। রূহুল মা'আনীতে জাবের ইবনে যায়েদ তাবেয়ীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, সূরা মুদ্দাস্‌সির সূরা মুয্‌যাম্মিলের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন কিন্তু উপরে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ওহী বিরতির পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। যদি সূরা মুয্‌যাম্মিল এর আগে অবতীর্ণ হত, তবে হাদীসের বর্ণনাকারী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) তা বর্ণনা করতেন বলা বাহুল্য যে, মুয্‌যাম্মিল ও মুদ্দাস্‌সির শব্দ দুটি প্রায় সমার্থবোধক। হতে পারে যে, একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় সূরা অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই ঘটনা হচ্ছে জিবরাঈল (আ)-কে আকাশের নীচে চেয়ারে উপবিষ্ট দেখা, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে কম-পক্ষে এতটুকু প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সূরা মুয্‌যাম্মিল ও মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াত-সমূহ ওহীর বিরতির পর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে নাযিল হয়েছে। সে সম্পর্কে রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে বিরোধ আছে। তবে সূরা ইক্‌রার প্রাথমিক আয়াতসমূহ যে সর্বাগ্রে নাযিল হয়েছে, একথা সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। উভয় সূরা যদিও কাছাকাছি সময়ে একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ

হয়েছে, তবুও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সূরা মুয্‌যাম্মিলের শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যক্তিগত সংশোধন সম্পর্কিত বিধানাবলী রয়েছে এবং সূরা মুদ্দাস্‌সিরের শুরুতে দাওয়াত, তবলীগ ও জনশুদ্ধি সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রদত্ত হয়েছে।

সূরা মুদ্দাস্‌সিরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত সর্বপ্রথম নির্দেশ এই: قُمْ فَاَنْذِرْ অর্থাৎ উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান'ও হাতে পারে। অর্থাৎ আপনি বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেওয়াও অবান্তর নয়। উদ্দেশ্য এই যে, এখন আপনি সাহস করে জনশুদ্ধির দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোন।

فَاَنْذِرْ শব্দটি انذار থেকে উদ্ভূত। অর্থ সতর্ক করা,। কিন্তু এমন সতর্ক করা, যা স্নেহ ও ভালবাসার উপর ভিত্তিশীল, যেমন পিতা তার সন্তানকে সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে সতর্ক করে। পয়গম্বরগণ এরূপই করে থাকেন। তাই তাঁরা بشير ও نذير উপাধিতে ভূষিত হন। نذير এর অর্থ স্নেহ ও সমমর্মিতার ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ক-কারী এবং بشير এর অর্থ সুসংবাদদাতা। রসূলুল্লাহ্ (সা)-রও এই উভয় উপাধি কোর-আনের স্থানে স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এ স্থলে শুধু সতর্ক করার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত মু'মিন মুসলমান গুণাগুণতি কয়েকজনই ছিল। অবশিষ্ট সবাই ছিল অবিশ্বাসী কাফির, যারা সুসংবাদের নয়---সতর্ক করারই যোগ্য পাত্র ছিল।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই: وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ শুধু আপন পালনকর্তার মহত্ত্ব বর্ণনা করুন কথায় ও কাজে। এখানে رب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এটাই এই নির্দে-শের মূল কারণ। যিনি সারাজাহানের পালনকর্তা, একমাত্র তিনিই সর্বপ্রকার মহত্ত্ব বর্ণনার যোগ্য। তকবীরের শাব্দিক অর্থ আল্লাহু আকবার বলা হয়ে থাকে। এতে নামাযের তকবীরে তাহ্‌রীমাসহ অন্যান্য তাকবীরও দাখিল আছে। এই নির্দেশকে নামাযের তকবীরে তাহ্‌রী-মার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কোরআনের ভাষায় কোন ইঙ্গিত নেই।

তৃতীয় নির্দেশ এই: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ — ثياب শব্দটি ثوب--এর বহুবচন। এর আসল ও আক্ষরিক অর্থ কাপড়। রূপক অর্থে কর্মকেও لباس ও ثوب বলা হয়; এমনিভাবে অন্তর, মন, চরিত্র ও ধর্মকেও বলা হয়। মানব দেহকেও لباس বলে ব্যক্ত করা হয়, যার সাক্ষ্য কোরআন ও আরবী বাক্য পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদগণ থেকে উপরোক্ত সকল অর্থই বর্ণিত আছে। বাহ্যত এতে কোন বৈপরীত্য নেই। এমতাবস্থায় নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্রতা থেকে

মুক্ত রাখুন। পায়জামা অথবা লুঙ্গি পায়ের গিঁটের নীচ পর্যন্ত পরিধান করার নিষেধাজ্ঞাও এ থেকে বোঝা যায়। কেননা, গিঁটের নীচ পর্যন্ত পরিহিত বস্ত্র নাপাক হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা থাকে। অতএব কাপড় পবিত্র রাখার আদেশের মধ্যে এ বিষয়ও দাখিল আছে যে, এভাবে কাপড় পরিধান কর যেন নাপাকী থেকে দূরে থাকে। হারাম অর্থ দ্বারা পোশাক তৈরী না করা এবং নিষিদ্ধ কাট্‌সাটে তৈরী না করাও এই আদেশের মধ্যে দাখিল আছে। পোশাক পবিত্র রাখার এই আদেশ বিশেষভাবে নামাযের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। তাই ফিকহ্‌বিদগণ বলেন: নামায ছাড়া অন্য অবস্থায়ও বিনা প্রয়োজনে শরীরকে নাপাক রাখা অথবা নাপাক কাপড় পরিধান করে থাকা অথবা নাপাক জায়গায় বসে থাকা জায়েয নয়। তবে প্রয়োজনের মুহূর্তগুলো ব্যতিক্রমভুক্ত।---(মাযহারী)

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা পছন্দ করেন। এক আয়াতে আছে: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ

التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ —হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে। তাই মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শরীর, স্থান ও পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং অন্তরকে অভ্যন্তরীণ অশুচি থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে।

চতুর্থ নির্দেশ এই: وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ----তফসীরবিদ মুজাহিদ, ইকরামা কাতাদাহ্, যুহরী, ইবনে যায়েদ প্রমুখ এ স্থলে رجز-এর অর্থ নিয়েছেন প্রতিমা। ইবনে আব্বাস (রা) এক রেওয়ায়েতে এর অর্থ নিয়েছেন গোনাহ্। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা অথবা গোনাহ্ পরিত্যাগ করুন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তো পূর্ব থেকেই ঐ সবের ধারে কাছে ছিলেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে এই আদেশ করার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতেও এসব বিষয় থেকে দূরে থাকুন। প্রকৃতপক্ষে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অতিশয় গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে রসূলকেই সম্বোধন করে আদেশটি দেওয়া হয়েছে। এতে উম্মত বুঝতে পারবে যে, আদেশটি খুবই গুরুত্ববহ। তাই নিষ্পাপ রসূলকেও এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

পঞ্চম নির্দেশ: وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ----অর্থাৎ বেশী পাওয়ার অভিপ্রায়ে কারও প্রতি অনুগ্রহ করো না। এ থেকে জানা যায় যে, প্রতিদানে বেশী দেবে, এই আশায় কাউকে উপঢৌকন দেওয়া নিন্দনীয় ও মাকরূহ্। কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা সাধারণ লোকের জন্য এর বৈধতা জানা গেলেও এটা সাধারণ ভদ্রতার পরিপন্থী। বিশেষত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য এটা হারাম।

ষষ্ঠ নির্দেশ: وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ — صبر-এর শাব্দিক অর্থ প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়া ও বশে রাখা। তাই আল্লাহ্ তা'আলার বিধি বিধান প্রতিপালনে প্রবৃত্তিকে কায়েম রাখা, আল্লাহ্র

হারামকৃত বস্তুসমূহ থেকে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা এবং বিপদাপদে যথাসাধ্য হাহুতাশ করা থেকে বেঁচে থাকাও সবরের মধ্যে দাখিল। সুতরাং এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক নির্দেশ, যা গোটা দীনকে পরিব্যাপ্ত করে। এ স্থলে বিশেষভাবে এই নির্দেশ দানের কারণ সম্ভবত এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে দীনের প্রতি দাওয়াত এবং শিরক ও কুফরকে বাধা দানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এর ফলশ্রুতি এই ছিল যে, অনেক মানুষ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরোধিতা ও শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হবে। তাই সবর ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলা তাঁর জন্য সমীচীন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কয়েকটি নির্দেশ দেওয়ার পর কিয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। نَاقُوْر শব্দের অর্থ শিংগা এবং نَقْر বলে শিংগায় ফুঁ দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। কিয়ামত দিবস সকল কাফিরের জন্যই কঠিন হবে—এ কথা বর্ণনা করার পর জনৈক দুষ্টমতি কাফিরের অবস্থাও তার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

**ওলীদ ইবনে মুগীরার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি গিনি ঃ** এই কাফিরের নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ভাষায় তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সওরী বলেন ঃ তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে এতটুকু সবার কাছেই স্বীকৃত যে, তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানী সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাই কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হত। জনসাধারণের মধ্যে তার উপাধি 'রায়হানা কোরায়শ' খ্যাত ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশত নিজেকে ওহীদ ইবনুল-ওহীদ অর্থাৎ এককের পুত্র একক বলত। তার দাবী ছিল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সে তার পিতা মুগীরা অদ্বিতীয়।---( কুরতুবী ) কিন্তু এই পাপিষ্ঠ আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করেনি এবং কোরআনকে আল্লাহ্র কালাম মেনে নেওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা রচনা বকে। সে কোরআনকে যাদু এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদুকর বলে প্রচার করে। তফসীরে কুরতুবীতে তার ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

রসূলে করীম (সা) একদিন حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ থেকে اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করছিলেন। ওলীদ ইবনে মুগীরা এই তিলাওয়াত শুনে একে আল্লাহ্র কালাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধ্য হয় যে ঃ

والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله

لمغرق و انه ليعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر-

—"আল্লাহ্‌র শপথ , আমি তাঁর মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোন মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোন জিনেরও হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ চাকচিক্য। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকবে এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়।"

আরবের সর্ববৃহৎ ঐশ্বর্যশালী সরদারের মুখে একথা উচ্চারিত হওয়া মাত্রই কোরাইশ-দের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের দিকে ঝুঁকতে লাগল। অপরদিকে কাফির কোরাইশ সরদাররা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল । তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হল। আবূ জাহ্‌ল বলল ঃ চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি এখনি যাচ্ছি, তাকে ঠিক করে আসব।

**আবূ জাহ্‌ল ও ওলীদের কথোপকথন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্যতায় মতৈক্য ঃ** আবূ জাহ্‌ল মুখমণ্ডলে কৃত্রিম বিষণ্ণতা ফুটিয়ে ওলীদের কাছে পৌঁছল ( এবং ইচ্ছাকৃত-ভাবেই এমন কথা বলল, যাতে সে রাগান্বিত হয় )। ওলীদ বলল ঃ ব্যাপার কি, তুমি এমন বিষণ্ণ কেন ? আবূ জাহ্‌ল বলল ঃ বিষণ্ণ না হয়ে উপায় কি, তারা সবাই চাঁদা সংগ্রহ করে তোমাকে অর্থকড়ি দেয়। কারণ, তুমি এখন বুড়ো হয়ে গেছ, তোমাকে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু এখন তারা জানতে পেরেছে যে, তুমি মুহাম্মদ ও ইবনে আবী কোহাফা অর্থাৎ আবূ বকরের কাছে যাতায়াত কর, যাতে তারা তোমাকে কিছু আহার্য দেয়। তুমি খোশামোদের ছলে তাদের কালাম শুনে বাহ্‌বা দাও এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কর। [ বাহ্যত চাঁদা করে ওলীদকে অর্থকড়ি দেওয়ার বিষয়টিও মিথ্যা ছিল, যা কেবল তাকে রাগান্বিত করার জন্যই বলা হয়েছিল। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে আহার্য গ্রহণের ব্যাপারটি তো মিথ্যা ছিলই ]। একথা শুনে ওলীদ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং অহংকারে পাগলপারা হয়ে বলতে লাগল ঃ একি বললে, আমি মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের রুটির টুকরার মুখাপেক্ষী? তুমি কি আমার ধন-দওলতের প্রাচুর্য সম্পর্কে জান না ? লাত ও ওযযার শপথ, আমি কখনও তাদের মুখাপেক্ষী নই। তবে তোমরা যে মুহাম্মদকে উন্মাদ বল, একথা মিথ্যা। এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাদের কেউ তাকে কোন পাগলসুলভ কাণ্ড করতে দেখেছ কি ? আবূ জাহ্‌ল স্বীকার করে বলল ঃ না, আমরা তা দেখিনি। ওলীদ বলল ঃ তোমরা তাকে কবি বল। জিজ্ঞাসা করি, তাকে কি কখনও কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছ ? আবূ জাহল বলল ঃ না, শুনিনি। ওলীদ বলল ঃ তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বল। বল তো দেখি, এ পর্যন্ত তার কোন কথা মিথ্যা পেয়েছ কি ? এর জওয়াবেও আবূ জাহ্‌লকে لا والله ( না , আল্লাহ্‌র শপথ ) বলতে হল। ওলীদ আরও বলল ঃ তোমরা তাকে অতীন্দ্রিয়বাদী বল। তোমরা কি কখনও তার এমন অবস্থা ও কথাবার্তা দেখেছ বা শুনেছ, যা অতী-ন্দ্রিয়বাদীদের হয়ে থাকে ? আমি অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথাবার্তা ভালরূপেই চিনি। তার

কালাম অতীন্দ্রিয়বাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এ ক্ষেত্রেও আবূ জাহ্‌লকে لا والله বলতে হল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র কোরাইশ গোত্রের মধ্যে 'আল-আমীন' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। ওলীদের যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তায় আবূ জাহ্‌ল হার মানতে বাধ্য হল এবং উপরোক্ত কুৎসা রটনার অসারতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করতে লাগল যে, তাহলে কি কথা বলে মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখা যায়! তাই সে ওলীদকেই সম্বোধন করে বলল ঃ তা হলে তুমিই বল মুহাম্মদকে কি বলা যায়। ওলীদ কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করল। অতঃপর আবূ জাহ্‌লের দিকে চোখ তুলে তাচ্ছিল্য প্রকাশার্থে মুখ ভেংচাল। অবশেষে বলল ঃ মুহাম্মদকে উন্মাদ, কবি, অতীন্দ্রিয়বাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যাবে না। হ্যাঁ, তাকে যাদুকর বললে তা যুৎসই হবে। এ হতভাগা খুব জানত যে, তিনি যাদুকরও নন এবং তাঁর কালামকে যাদুকরদের কালামও বলা যায় না। কিন্তু সে এভাবে তার কথাকে দাঁড় করাল যে, তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও যাদুকরদের যাদুর প্রতিক্রিয়ার ন্যায় হয়ে থাকে। যাদুকররা তাদের যাদু বলে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিত। নাউযুবিল্লাহ্! তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ। যে-ই ঈমান আনে সে-ই তার কাফির পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। ওলীদের এই ঘটনার শেষাংশই কোরআন পাক নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ব্যক্ত করেছে ঃ

اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ-

এখানে قدر শব্দটি تقدير থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রস্তাব করা। উদ্দেশ্য এই যে, এই হতভাগা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করারই সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু অপমানের ভয়ে পরিষ্কার মিথ্যা বলা থেকে বিরত রইল। তাই অনেক চিন্তাভাবনার পর প্রস্তাব করল, তাঁকে উপরোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে যাদুকর বলা হোক। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ বলে ওর প্রতি পুনঃ পুনঃ অভিসম্পাত করেছেন।

**কাফিররাও মিথ্যা ভাষণে বিরত থাকত ঃ** চিন্তা করুন, সব কোরাইশ সরদারই কাফির পাপাচারী এবং নানা রকম গোনাহ্ ও অশ্লীল কার্যের সাথে জড়িত থাকত কিন্তু মিথ্যা ভাষণ এমন একটি দোষ, যা থেকে কাফিররাও পলায়ন করত। ইসলাম-পূর্বকালে রোম সম্রাটের দরবারে আবূ সুফিয়ানের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, কাফিররা রসূলে করীম (সা)-এর

বিরোধিতায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু মিথ্যা বলায় প্রস্তুত ছিল না। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান বিপরীতমুখী উন্নতির যুগে এই দোষটি যেন দোষই নয়; বরং সবচাইতে বড় নৈপুণ্যে পরিণত হয়ে গেছে। শুধু কাফির পাপিষ্ঠই নয়, সৎ ও ধার্মিক মুসলমানদের মন থেকেও এর প্রতি ঘৃণা দূর হয়ে গেছে। তারা অনর্গল মিথ্যা বলা ও অপরকে বলতে বাধ্য করাকে গর্বের সাথে বর্ণনা করে।---(নাউযুবিল্লাহ্)

**সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা একটি নিয়ামত :** ওলীদ ইবনে মুগীরাকে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব নিয়ামত দান করেছিলেন তন্মধ্যে একটি ছিল بَنِينَ شُهُودًا অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা। এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করা ও জীবিত থাকা যেমন নিয়ামত, তেমনিভাবে সন্তান-সন্ততি কাছে উপস্থিত থাকাও আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। তারা পিতামাতার চক্ষু শীতল করে এবং অন্তরকে শান্ত রাখে। তাদের উপস্থিতির দ্বারা পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও কাজকারবারে সাহায্য পাওয়া আর একটি অতিরিক্ত নিয়ামত। বর্তমান বিপরীতমুখী উন্নতি কেবল সোনারূপার মুদ্রা ও কাগজী নোটের নাম রেখেছে আরাম-আয়েশ, যার জন্য পিতামাতা অত্যন্ত গর্বের সাথে সন্তান-সন্ততিকে বিদেশে নিক্ষেপ করে দেয়। তারা এতই আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে, বছরের পর বছর সন্তানের মুখ না দেখলেও সন্তানের মোটা অংকের বেতন ও অগাধ আমদানীর খবর তাদের কানে পৌঁছতে থাকে। তারা এই খবরের মাধ্যমে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার প্রয়াস পায়। মনে হয়, তারা সুখ ও আরামের অর্থ সম্পর্কেই বেখবর হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলাকে বিস্মৃত হওয়ার পরিণতি এটাই হওয়া স্বাভাবিক যে, তার নিজেদেরকে অর্থাৎ নিজেদের প্রকৃত সুখ ও আরামকেও বিস্মৃত হয়ে যাবে। কোরআন বলে : نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ---তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন : এটা আবু জাহ্লের উক্তির জওয়াব। সে যখন কোরআনের এই বক্তব্য শুনল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশ জন ফেরেশতা, তখন কোরাইশ যুবকদেরকে সম্বোধন করে বলল : মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশ জন। অতএব তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুদ্দী বলেন : উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাযিল হলে পর জনৈক নগণ্য কোরাইশ কাফির বলে উঠল : হে কোরাইশ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্য আমি একাই যথেষ্ট। আমি ডান বাহু দ্বারা দশজনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয়জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিস্‌সা চুকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় : আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমত, ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট। এখানে যে উনিশজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফিরদেরকে আযাব দেওয়ার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর কিয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা

হয়েছে ঃ اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ — كُبَر শব্দটি كُبْرى এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে জাহান্নামে দাখিল করা হবে, সেটি সাক্ষাত গুরুতর বিপদ। এ ছাড়া তাতে রয়েছে আরো নানা রকম আযাব।

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ — এখানে অগ্রে যাওয়ার অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতর্ক করা সব মানুষের জন্য ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোন কোন হতভাগা এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়।

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلَّا اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ — رَهِيْنَةٌ-এর অর্থ এখানে প্রত্যেকের আটক ও বন্দী হওয়া। ঋণের পরিবর্তে বন্ধকী দ্রব্য যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে---মালিক তাকে কোন কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে আটক ও বন্দী থাকবে। কিন্তু, 'আস্‌হাবুল ইয়ামীন' তথা ডানদিকের সৎ লোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে।

এখানে জাহান্নামে বন্দী থাকাও অর্থ হতে পারে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য জাহান্নামে বন্দী থাকবে। কিন্তু 'আস্‌হাবুল ইয়ামীন' বন্দী থাকবে না। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা গেল যে, আস্‌হাবুল ইয়ামীন তারা, যারা ঋণ পরিশোধ করেছে এবং করজ ও ফরয সব আদায় করেছে। অতএব তাদের বন্দী থাকার কোন কারণ নেই। এই তফসীর বাহ্যত নির্মল ও সহজবোধ্য। পক্ষান্তরে যদি আটক থাকার অর্থ হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত এবং দোযখে প্রবেশ করার পূর্বে কোন স্থানে আটক থাকা নেওয়া হয়, তবে এর সারমর্ম এই হবে যে, সব লোক হিসাব-নিকাশের জন্য আটক থাকবে এবং হিসাব না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোথাও যেতে পারবে না। এমতাবস্থায় আস্‌হাবুল ইয়ামীন তারা হতে পারে, যাদের হিসাব-নিকাশ নেই এবং নিষ্পাপ। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা। এটা হযরত আলীর উক্তি। অথবা তারা হতে পারে, যাদের সম্পর্কে হাদীসে আছে ঃ এই উম্মতের অনেক লোককে হিসাব থেকে মুক্তি দিয়ে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করা হবে। সূরা ওয়াকিয়ায় হাশরে উপস্থিত লোকদের তিন প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে---১. অগ্রগামী ও নৈকট্যশীল, ২. ডানদিকস্থ লোক ও ৩. বাম দিকস্থ লোক। এই সূরায় নৈকট্যশীল-গণকে ডান দিকস্থ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে শুধু 'আস্‌হাবুল ইয়ামীন' উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থের দিক দিয়ে সকল আস্‌হাবুল ইয়ামীন হিসাব থেকে মুক্ত থাকবে---একথা কোন আয়াত অথবা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই। তাই এ আয়াতের তফসীর জাহান্নামে আটক থাকা গ্রহণ করলে সেটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ—এখানে هُمْ সর্বনাম দ্বারা সেসব অপরাধীকে বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ স্বীকার করেছে—১. তারা নামায পড়ত না, ২. তারা কোন অভাবগ্রস্ত ফকীরকে আহার্য দিত না অর্থাৎ দরিদ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, ৩. ভ্রান্ত লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত অথবা গোনাহ্ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হত, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত হত এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, ৪. তারা কিয়ামত অস্বীকার করত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব অপরাধী এসব গোনাহ্ করে এবং কিয়ামত অস্বীকার করার মত কুফরী করে, তাদের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা, তারা কাফির। কাফিরের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহণীয় হবে না। যদি সব সুপারিশকারী একত্রিত হয়ে জোরেসোরে সুপারিশ করে, তাতেও উপকার হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ বলা হয়েছে।

**কাফিরের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না, মু'মিনের জন্য হবে :** এই আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, মুসলমান গোনাহ্গার হলেও তার জন্য সুপারিশ উপকারী হবে। অনেক সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবীগণ, ওলীগণ, সৎকর্মপরায়নগণ—এমনকি সাধারণ মু'মিগণও অপরের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তা কবূল হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ বলেন : পরকালে আল্লাহর ফেরেশতাগণ, পয়গম্বরগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপীদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তাঁদের সুপারিশের কারণে পাপীরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তবে উপরোল্লিখিত চার প্রকার লোক মুক্তি পাবে না; অর্থাৎ যারা নামায ও যাকাত তরক করে, কাফিরদের ইসলাম বিরোধী কথাবার্তায় শরীক থাকে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে। এ থেকে জানা যায় যে, বেনামাযী ও যাকাত তরককারীর জন্য সুপারিশ কবূল হবে না। কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে এ কথাই শুদ্ধ মনে হয় যে, যারা কিয়ামত অস্বীকার সহ উপরোক্ত চারটি অপরাধ করবে, তাদের জন্যই সুপারিশ কবূল হবে না। আর যারা কিয়ামত অস্বীকার ব্যতীত আলাদা আলাদা অন্যান্য অপরাধ করবে, তাদের জন্য এই শাস্তি জরুরী নয়। কিন্তু কতক হাদীসে বিশেষ বিশেষ গোনাহ্গার সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তারা সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সুপারিশ বা নবী-রসূলগণের শাফা'আত সত্য বলে বিশ্বাস করে না অথবা হাউযে কাওসারের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সুপারিশ এবং হাউযে কাওসারে তার কোন অংশ নেই।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ—এখানে تَذْكِرَةٌ তথা উপদেশ বলে কোরআন মজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর শাব্দিক অর্থ স্মারক। কোরআন পাক আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী, রহমত, গযব, সওয়াব ও আযাবের অদ্বিতীয় স্মারক। শেষে বলা

হয়েছে كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ—অর্থাৎ নিশ্চিতই কোরআন উপদেশ, যা তোমরা বর্জন করে রেখেছ। قَسْوَرَةٌ এর অর্থ সিংহ এবং তীরন্দাজ শিকারী। এ স্থলে সাহাবায়ে কিরাম থেকে উভয় অর্থ বর্ণিত আছে।

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ—আল্লাহ্ তা'আলা اهل تقوى এই অর্থে যে, একমাত্র তিনিই ভয় করার ও তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার যোগ্য। اهل مغفرت হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই বড় বড় অপরাধী ও গোনাহ্গারের অপরাধ ও গোনাহ্ যখন ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। অন্য কেউ এরূপ উচ্চমনা হতে পারে না।